সুরের সাধনায় বাঙালি

তাপসী রায়চৌধুরী

মানুষের আবেগ অনুভূতি, ব্যথা বেদনা, ভালোলাগা মন্দলাগার এক সূক্ষ্মতম বাহন সংগীত। মানুষের আত্মিক প্রকাশের এই আদিম ভাষাটি সবদেশে সবকালের ধর্মচর্চারও প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পাশ্চাত্ত সংগীতের উৎস সন্ধানে বের হয়ে আমাদের যেমন চার্চের আদ্দিপর্বে প্রবেশ করতে হয়, ঠিক তেমনই ভারতীয় সংগীতের গঙ্গোত্রিকেও আমরা আবিষ্কার করি ঋক্ ও সামবেদের সূক্তাবলীর মধ্যে। বঙ্গ সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি সম্প্রসারিত রূপ। বাংলা সংগীতও তাই ভারতীয় ধর্মসাধনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে। তাই দেখি এদেশের পালাপার্বণে গানের ছড়াছড়ি, পদাবলী আর পাঁচালি কাব্যের অঙ্গে অঙ্গে সুরের স্পর্শ।

বাংলা কাব্যের আদি পর্বকে একই সঙ্গে বাংলা সংগীতেরও আদি পর্ব বলা যায় । আবার এই কাব্যধারার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠেছে বাঙালির ধর্মীয়চেতনা। তাই বলা যায় বাংলার ধর্মীয় জগৎ আর সাংগীতিক পরিমন্ডলটি বাংলা কাব্যের ছায়াতলে পুষ্টিলাভ করেছে। আসলে যে জাতি অন্তর্মুখী বা introvart তাকে কথা বলতেই হয় গানের ভাষায়। এই অন্তর্মুখীনতা বাঙালি জাতির স্বভাবধর্ম। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে হয়,'আত্মপ্রকাশের জন্য বাঙালি স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে,' বাঙালির জীবনে বিলাসের উপকরণ হিসাবে সংগীত আসেনি। সংগীত বাঙালির নিছক সৌন্দর্যসচেতন মানসিকতার অনুরাগের সামগ্রী নয়, সংগীত বাঙালির একমাত্র বাতায়ন। আর সে কারণেই বাংলার কবি তার অনুভূতির ফসলকে শুধুমাত্র বাক্যবদ্ধ করেই তৃপ্তি পাননি, তাতে সুরারোপ করেছেন। তালের ঝোঁকে আর সুরের দোলায় তাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সত্তার গভীরে। কথায় এই সুর সংযোজন সম্পর্কে নাট্যকার মনোমোহন বসু বলেন,

> ইউরোপে নাটককাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিধ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন, এটি জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক, যে দেশের বেদ অবাধ গুরু মহাশয়ের

পাঠশালার ধারাপাত পর্যন্ত স্বরসংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি ?

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক জগতে সংগীতের এই ভূমিকার কথা যাজ্ঞবল্ক্যও বলেন। তিনি বলেন, বীণাবাদনের তত্ত্ব যিনি জানেন এবং যিনি শ্রুতিজাতি বিশারদ তিনি অনায়াসে মোক্ষ মার্গচারী হতে পারেন। এমনকি 'সাহিত্য সংগীত কলাবিহীন' ব্যক্তিকে ভর্তৃহরি পশুর সমতুল্য বলে মনে হয়েছে।

বাংলা সংগীতের প্রথম পদক্ষেপ চর্যাপদে কারণ চর্যাপদ গীতের আকারে লেখা পদের সমষ্টি। প্রত্যেক চর্যাপদের শীর্ষদেশে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। যেমন পটমঞ্জরী, বরাড়ী, মল্লার, মালশী, বঙ্গালী, বলাড্ডি, কামোদি, গুঞ্জরী, ভৈরবী, রামক্রী, দেশাখ, গুর্জ্জরী, শবরী প্রভৃতি। পদগুলি গীত হত। আরোহণ, অবরোহণ এবং বিভিন্ন প্রকার রাগরাগিণীর বিচিত্রতানে এই গানগুলিকে পরিবেশিত করা হত। চর্যার গড়ন হয় —__— বা = জাতী। বৈষ্ণব পদে এবং মঙ্গল সাহিত্যেও এর প্রভাব পড়েছে।

বাংলা সংগীতের আদি ও মধ্যযুগের সেতুপথ নির্মাণ করেছেন 'গীতগোবিন্দ' রচয়িতা কবি জয়দেব। লক্ষণ সেনের সভাকবি জয়দেবের সংগীত প্রীতির কথা 'সেকশুভোদয়া' ও সংস্কৃত 'ভক্তমাল' গ্রন্থে পাওয়া যায়। কবিপত্নীও সংগীতে নিপুণা ছিলেন বলে জানা যায়। 'গীতগোবিন্দ' গীতিসর্বস্ব। গ্রন্থটির নামই এর সংগীত বহুলতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভাবপ্রবণতা ও গীতবাহুল্যের জন্য দেশীয় গীতাভিনয়ের সাথে মিল আছে বলে মনে হয়। নাটকটির কুশীলব কৃষ্ণ , রাধা এবং সখীর উক্তিগুলি এখানে গীতের আকারে সাজানো রয়েছে। পন্ডিতেরা অনুমান করেছিলেন কবি নিজেই গীতগোবিন্দের গান, রাগ ও তালের যোজনা করেছিলেন। সংগীতগুলি মার্গ সংগীতের লক্ষণাক্রান্ত হলেও জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতে পেরেছিল। শ্রী সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী মনে করেন যে এখানে বারটি রাগের কথা আছে। এগুলি হল, গুর্জরী, দেশবরাড়ী, বসন্ত, রামকিরী, মানবগৌড়, কর্ণাট, দেশাখ,গোস্তকিরী, মালব, ভৈরবী, বরাড়ী, বিভাস। এছাড়া তান প্রয়োগেও জয়দেব বৈচিত্র্য এনেছেন। এখানে তিনি যতি, একতালি, রূপক, নিঃস্বাব, অষ্টতাল এই পাঁচ রকম তালের ব্যবহার করেছেন। গীতগোবিন্দের ১২ টি রাগের মধ্যে ১০ টির বর্ণনা 'রাগতরঙ্গিণী'তে (বল্লাল সেনের সময় লোচনাচার্য কতৃক সংকলিত) পাওয়া যায়। এর মধ্যে সাতটি ভৈরব ঠাটের অন্তর্গত।

জয়দেব তার গীতগোবিন্দের (দ্বাদশ শতাব্দী) একটি শ্লোকে বলেছিলেন,

শ্রিত কমলা কুচমণ্ডল /ধৃত কুণ্ডল/ললিত কলিন বনমাল
জয় জয় দেব হরে।। ধ্রু (ধুয়া)

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'ধ্রুয়াগীতং' শব্দটি দেখেছি। পরবর্তীকালে রাজশেখরের 'কর্পুরমঞ্জরী' নাটকেও এই শব্দটি পাওয়া যায়। এই ধুয়া কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যে প্রথম লক্ষ্য করি। 'মদগোত্রাঙ্কং বিরচিত পদং গেয়ং উদগাতু কা মা'—

'আমার নাম যুক্ত আমার বিরচিত পদ আমার বিরহী স্ত্রী গান গাইছেন' এখান থেকেই কবিরা ভণিতা ব্যবহার করতে শুরু করেছেন। জয়দেব এই ভণিতা বা ধুয়াকেই নিয়ে এলেন বাংলা সাহিত্যে।

বাংলা গীতিকাব্যে অন্তমিলও এসেছে জয়দেবের হাত ধরে। প্রত্ন বাংলা বলতে আমরা চর্যার ভাষাকে বুঝি। এখানে প্রতি দুটি লাইন অন্তর দুটি করে যতি পড়ে। এখানে যে অন্তমিল আছে তা এসেছে অপভ্রংশ কবিতা থেকে। জয়দেব এই অপভ্রংশ থেকেই অন্তমিল বিষয়টিকে গ্রহণ করেছেন প্যাটর্ন তালবিন্যাস প্রভৃতি দিক থেকে জয়দেব বাংলার সংগীতকে উচ্চস্থানে নিয়ে গিয়েছেন।

জয়দেবের সমসাময়িক কালে বাংলা সংগীত জগতে এক মিশ্র সংগীত ঘরানার সৃষ্টি হয়েছিল। উত্তর ভারতীয় মার্গ সংগীত ও দক্ষিণ ভারতীয় মার্গ সংগীতের চরিত্রগত পার্থক্য আছে। দেখা যাচ্ছে একাদশ শতকে দক্ষিণ ভারত থেকে সেন বংশীয়রা এলেন বাংলা দেশে, সেই সঙ্গে নিয়ে এলেন কিছু দক্ষিণ ভারতীয় জ্ঞানী গুণী শিল্পী, এদের মাধ্যমে এসেছিল 'কর্ণাটি' রাগ এরকম ভাবা যায়। যেমন দেশাখ রাগে রূপক তালে তাম্বুল খন্ডে কৃষ্ণ রাধার রূপে পাগল হয়ে বড়ায়ির কাছে আর্তি জানিয়েছে

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা শুনি
ধরিবারে না পাঁরো পরাণী। বড়াইল

এই সময় যে কিছু মিশ্র রাগের উদ্ভব হয়, তা রাগের নাম থেকেই বোঝা যায়, যেমন,

তিলক + কামোদ = তিলক কামোদ
গৌড় + মালব = গৌড় মালব,

মালব রাগ গৌড়ে এসে হয়ে গেল গৌড় মালব। আবার গুর্জরী এবং বিলাসখানি এই দুই রাগের সমন্বয়ে তৈরি হল টোড়ী রাগ। এই সময় উত্তর ভারতীয় মার্গ সংগীত, দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাট সংগীত এবং মিশ্র সংগীতের পাশাপাশি দেশী রাগের একটি ধারাও প্রবহমান ছিল। এগুলি হল গুণকরী, দেশ, বড়ায়ী, বিরাটি, দেশ রাগটি এখনও বাংলা সংগীতজগতে আদরণীয়। রবীন্দ্রনাথের 'মেঘ বলেছে যাব যাব' সংগীতটি এই 'দেশ' রাগকে আশ্রয় করে সৃষ্টি হয়েছে। এ সব রাগেরই কম বেশী পরিচয় জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' পাওয়া যায় ।

আনুমানিক পঞ্চদশ শতাব্দীর গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য বাংলা সংগীত চর্চার এক নির্ভরযোগ্য দলিল। এ কাব্যের সবগুলি কবিতাই গীত। এইসব গীতের সুর ও তালাদির পরিচয় গীতের শীর্ষে দেওয়া আছে। এ কাব্যে কোড়া, বরাড়ী, গুর্জ্জরী, দেশাগ, ধানুষী, রামগীরি, আহের, বেলাবলী, মালব, মল্লার, কহু, ভাটিয়ালী, কেদার, মঙ্গল, গৌরী, বাগেশ্রী, পটমঞ্জরী প্রভৃতি ৩২ প্রকার রাগের পরিচয় পাওয়া যায়। চর্যার বহু রাগকে সামান্য নামের পরিবর্তন ঘটিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যুক্ত হতে দেখি যেমন,

চ কহ্নু গুঞ্জরী > কৃ কহু গুর্জ্জরী
চ দেশাখ > কৃ দেশাগ
চ ধনসী > কৃ ধানুষী
চ রামক্রী > কৃ রামগিরী > গীত রামকিরী

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' প্রাপ্ত এই রাগ রাগিণীগুলির উল্লেখ প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রগুলিতেও পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আহের (আভীর), কক্কু বা কহু (ককুএ), ধানুষী (ধনাশ্রী), দেশাগ (দেশাখ) ইত্যাদি রাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। তবে অধিকাংশ নামের মধ্যেই কোন দেশীয় বা স্থানীয় রীতির পরিচয় আছে বলে মনে হয়।

চর্যাপদ থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এই বাংলা সংগীতের আদিপর্বকে পর্যালোচনা করে একথা বলা যায় প্রায় তিনশত বছর ধরে একটা নির্দিষ্ট গীতপদ্ধতি মোটামুটি অপরিবর্তিত রূপেই বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' গানগুলি যে সকল রাগে গাওয়া হত, তার মধ্যে ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রামগিরি, ধানুষী, পটমঞ্জরী, মল্লার, দেশাখ—এই রাগগুলি চর্যাপদেও ব্যবহৃত হয়েছিল। আবার 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে' কর্ণাট ও গোন্তকিরী ব্যতীত 'গীতগোবিন্দে'র অপর সকল রাগিণীর উল্লেখ আছে। শুধু রাগের নয় তালের ক্ষেত্রেও এমন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যতি রূপক প্রভৃতি তালের উল্লেখ 'গীতগোবিন্দ' বা 'চর্যাপদের' মতন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'রও অধিকাংশ গানে লক্ষ্য করা যায়। তবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' কয়েকটি নতুন রাগেরও নাম পাওয়া যায়। যেমন ভাটিয়ালি, কোঁড়া, পাহাড়িয়া, কিংবা আহের এইসব রাগগুলি অনার্য জাতির লোক প্রচলিত কোন সুরের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন,

> ...অনার্য আদিম জাতি প্রত্যেকেই অন্তত একটি করিয়া রাগিণী আর্য সংগীতকে উপহার দিয়েছে। আভীরি (আহিরী) রাগিণী অনার্য 'আভীর' জাতির দান। অতি প্রাচীন শবরজাতি শাবেরিকা (শাবেরী বা সাবেরী) নামে রাগিণী উপহার দিয়েছেন ভূমিকা : রাগ ও রূপ — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।

অর্থাৎ এই সময় পূর্ব ভারতে আর্য ও অনার্য সংস্কৃতির মিলন এমন কথা বলা যায়।

সাধারণভাবে মনে করা হয় ধ্রুপদ গানের সূচনা গোয়ালিয়র অঞ্চলে এবং এর চারটি বাণী স্পষ্টভাবে প্রচলিত হয়েছে রাজা মানসিংহের সময়ে (১৪৬৮-১৫১৭), কিন্তু এর চারটি বাণীর মধ্যে উল্লেখিত 'গওহরবাণী' গৌড়বাণীর উচ্চারণ ভেদ হয় তাহলে চর্যাগান বা জয়দেবের গীতধ্রুপদের রূপবন্ধের প্রাচীনতম নিদর্শন বলা যেতে পারে। তাছাড়া পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে যেভাবে ধ্রুপদের প্রচলন হয়েছে তাতে এই বিশিষ্ট ভাবগম্ভীর গীতরীতির সঙ্গে বাঙালি জাতির একটা দীর্ঘস্থায়ী আত্মিক যোগাযোগ আছে বলেই মনে হয়।

মধ্যযুগে মার্গ সংগীতের পাশাপাশি লৌকিক সংগীতের একটা ধারাও প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। মানুষ মঙ্গল আকাঙ্ক্ষায় এই লোক সংগীতের জন্ম দিত। মথুরায় যাবার পথে গোপীরা গেয়েছিল মঙ্গল গান, 'জায়িতে হরসিত মনে গায়িতে

মঙ্গলে'। এখানে মঙ্গল গানের পরিচয় পাই। আবার বিজয় গুপ্তর মনসা মঙ্গলে চন্ডী শিবকে বলেছে,

চন্ডী আই তোমার মুখে
এঁয়ো আসিবে মঙ্গল গাইতে
চাইবে গুয়া পান খাইতে

এই মঙ্গল গান পরবর্তীকালে আসরে গাওয়া হত। মনসা পালার নাম 'ভাসান'। চন্ডী বা দুর্গাপূজার সময় ওই গানকে বলা হত 'জাগরণ', ধর্ম ঠাকুরের গানের সময় একে বলা হত 'বারমতি'। কিন্তু সব গানই হত আসরে। ভাসান ও জাগরণ আট পালা বিশিষ্ট , তাই এর নাম অষ্টমঙ্গলা ।

মধ্যযুগীয় সাংগীতিক পরিমন্ডলকে আমরা খুঁজে পাই দামোদর সেনের 'সংগীত দামোদরে', সংগীতের তত্ত্ব নিয়ে লেখা লোচন পন্ডিতের 'রাগ তরঙ্গিণী' তে এবং নরহরি কবিরাজের 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে।

'ভক্তিরত্নাকরে' বাংলা সংগীতের প্রথম তাত্ত্বিক আলোচনা দেখতে পাই। তিনি বলেন,

গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার
ধাতু মাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার

ধাতু অর্থাৎ সংগীতের কাঠামো। এই অংশে সংগীতের চারটি অংশের কথা বলেছেন। এগুলি হল অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, এবং আভোগ। এদের একত্রে 'তুক' বলে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রসংগীতের উল্লেখ করা যায়। 'মাতু' অর্থে এখানে লেখক বাক্যাংশের কথা বলেছেন। এই গ্রন্থে লেখক কিছু কিছু অজ্ঞাতনামা রাগের উল্লেখ করেছেন। যেমন—'কাষ্ঠা', 'জাকড়ী', 'শাবর', 'করঞ্জী' ইত্যাদি। 'ভক্তিরত্নাকরে' কিছু কিছু বাদ্যের নামও পাওয়া যায় যেমন—একতারা, দোতারা, সেতার, রবাব ইত্যাদি।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর বঙ্গ বিজয় করে। এই বঙ্গ বিজয় বাংলা সংগীত জগতে পরিবর্তন আনে। রাজ্যেশ্বর মিত্র 'মুঘল যুগের সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে এই পরিবর্তনের কথা বলেছেন। হরিদাস স্বামী, তানসেন, সদারঙ্গ সংগীতে একটি নতুন যুগের জন্ম দেন। এরা তিন জনই বাঙালি ছিলেন এমন জনশ্রুতি আছে। মার্গ সংগীতের তিনটি ধারা ধ্রুপদ, খেয়াল, ও টপ্পা। ধ্রুপদের চর্চা বাংলাদেশে ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের যুগে খেয়াল এল বাংলা সংগীতজগতে। আবার মোগলদের মামাবাড়ি ছিল ইরানে, তাই বঙ্গ বিজয়ের পর ইরানীয় সংস্কৃতি মূলত সুফি সাধনা বাংলার ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলল। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তর আসে। সুফী সাধনার সংস্পর্শে এসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাগাত্মিকা ভক্তি, সখী সাধনা যুক্ত হল। এই বৈষ্ণব ধর্ম থেকেই জন্ম নিল কীর্তন।

সংগীতের সুরের সূক্ষ্মতম কারুকলায় এবং ছন্দ ও লয়ের জটিলতম রূপ বৈচিত্রে এ দেশের শিল্পী মনের বিস্ময়কর সিদ্ধি অর্জনের দৃষ্টান্ত আছে এই কীর্তন

মঙ্গলে'। এখানে মঙ্গল গানের পরিচয় পাই। আবার বিজয় গুপ্তর মনসা মঙ্গলে চন্ডী শিবকে বলেছে,

চন্ডী আই তোমার মুখে
এঁয়ো আসিবে মঙ্গল গাইতে
চাইবে গুয়া পান খাইতে

এই মঙ্গল গান পরবর্তীকালে আসরে গাওয়া হত। মনসা পালার নাম 'ভাসান'। চন্ডী বা দুর্গাপূজার সময় ওই গানকে বলা হত 'জাগরণ', ধর্ম ঠাকুরের গানের সময় একে বলা হত 'বারমতি'। কিন্তু সব গানই হত আসরে। ভাসান ও জাগরণ আট পালা বিশিষ্ট , তাই এর নাম অষ্টমঙ্গলা ।

মধ্যযুগীয় সাংগীতিক পরিমন্ডলকে আমরা খুঁজে পাই দামোদর সেনের 'সংগীত দামোদরে', সংগীতের তত্ত্ব নিয়ে লেখা লোচন পন্ডিতের 'রাগ তরঙ্গিণী' তে এবং নরহরি কবিরাজের 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে।

'ভক্তিরত্নাকরে' বাংলা সংগীতের প্রথম তাত্ত্বিক আলোচনা দেখতে পাই। তিনি বলেন,

গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার
ধাতু মাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার

ধাতু অর্থাৎ সংগীতের কাঠামো। এই অংশে সংগীতের চারটি অংশের কথা বলেছেন। এগুলি হল অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, এবং আভোগ। এদের একত্রে 'তুক' বলে। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রসংগীতের উল্লেখ করা যায়। 'মাতু' অর্থে এখানে লেখক বাক্যাংশের কথা বলেছেন। এই গ্রন্থে লেখক কিছু কিছু অজ্ঞাতনামা রাগের উল্লেখ করেছেন। যেমন—'কাষ্ঠা', 'জাকড়ী', 'শাবর', 'করঞ্জী' ইত্যাদি। 'ভক্তিরত্নাকরে' কিছু কিছু বাদ্যের নামও পাওয়া যায় যেমন—একতারা, দোতারা, সেতার, রবাব ইত্যাদি।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর বঙ্গ বিজয় করে। এই বঙ্গ বিজয় বাংলা সংগীত জগতে পরিবর্তন আনে। রাজ্যেশ্বর মিত্র 'মুঘল যুগের সংগীতচিন্তা' গ্রন্থে এই পরিবর্তনের কথা বলেছেন। হরিদাস স্বামী, তানসেন, সদারঙ্গ সংগীতে একটি নতুন যুগের জন্ম দেন। এরা তিন জনই বাঙালি ছিলেন এমন জনশ্রুতি আছে। মার্গ সংগীতের তিনটি ধারা ধ্রুপদ, খেয়াল, ও টপ্পা। ধ্রুপদের চর্চা বাংলাদেশে ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের যুগে খেয়াল এল বাংলা সংগীতজগতে। আবার মোগলদের মামাবাড়ি ছিল ইরানে, তাই বঙ্গ বিজয়ের পর ইরানীয় সংস্কৃতি মূলত সুফি সাধনা বাংলার ধর্মীয় জীবনে প্রভাব ফেলল। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রূপান্তর আসে। সূফী সাধনার সংস্পর্শে এসে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে রাগাত্মিকা ভক্তি, সখী সাধনা যুক্ত হল। এই বৈষ্ণব ধর্ম থেকেই জন্ম নিল কীর্তন।

সংগীতের সুরের সূক্ষ্মতম কারুকলায় এবং ছন্দ ও লয়ের জটিলতম রূপ বৈচিত্রে এ দেশের শিল্পী মনের বিস্ময়কর সিদ্ধি অর্জনের দৃষ্টান্ত আছে এই কীর্তন

গানে। বাঙালির সংগীত চিন্তায় চিরকালই কাব্য ও সুরের যে সমান দাবী থেকে গেছে কীর্তন গানে তারই প্রমাণ আছে। কীর্তন ইতিপূর্বে বাংলায় ছিল না। রাজসভা বা তুর্কী, পাঠানের সাংগীতিক পরিমন্ডলেও কীর্তনের অস্তিত্ব ছিল না। রসকীর্তন ও লীলাকীর্তন মহাপ্রভুর সময় থেকেই প্রচার হতে আরম্ভ হয় এবং রসকীর্তন ও লীলাকীর্তন বৈষ্ণব সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়। বিশেষত লীলাকীর্তন প্রবর্তিত করেন রাধামোহন ঠাকুর। কীর্তনীয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এর তিনটি ধারা উৎপন্ন হল। এগুলি হল মনোহর সাহী, রেনেটি ও গরণহাটি। রাঢ়বঙ্গে বোলপুরের নিকটবর্তী মনোহরসাহী পরগনা থেকে মনোহরসাহী ঘরানার উদ্ভব। বরেন্দ্রভূমির রাজশাহী জেলার খেতুর অংশ থেকে সূচিত হয় গরণহাটি ধারার এবং উৎকল অঞ্চলে শ্যামানন্দ দাস রেনেটি ধারার প্রচলন করেন। অবশ্য এর মধ্যে মনোহরসাহী ধারাটিই সব থেকে বেশি পুষ্টিলাভ করেছিল। পরবর্তীকালে রেনেটি ও গরণহাটি ধারাটি লুপ্ত হয়ে যায়। অবশ্য এ বাদেও বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর অঞ্চলে মান্দারণী ধারা বলে স্বতন্ত্র একটি ধারার প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। লীলাকীর্তন বা পালাকীর্তন অনেকটাই মার্গসংগীত ঘেঁষা। বলা যায় মার্গসংগীতের সঙ্গে দেশীয় ধারা এবং আখর বা ধুয়া যুক্ত হয়ে লীলাকীর্তনের বিন্যাস সম্পূর্ণ হয়েছে। মার্গসংগীতের অনেকটা সগোত্র হলেও পদাবলী কীর্তন, লীলাকীর্তন, হিন্দুস্থানি গীতরীতির অনুকরণ নয়। এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ এর কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন,

> কানাড়া, আড়ানা, মালকোষ, দরবারী, তোড়ীর বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে। গানকে ভালবেসেছে বলেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে, আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান)

মধ্যযুগীয় বাংলা সংগীতের অন্য দুটি প্রধান ধারা হল বাউল সংগীত ও রামপ্রসাদী গান। হিন্দু ও মুসলমানের মিশ্র সংস্কৃতির ফসল হল বাউল। খ্রিস্টিয় ১৪শ শতাব্দীর শেষে কিংবা ১৫ শতাব্দীর শুরুতে ইরানীয় সুফি ধর্মের প্রভাবে বাংলাদেশে এই সংগীত ঘরানার উদ্ভব হয়। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে এরা একতারাই একমাত্র ব্যবহার করে। বাংলা সংগীতের বৃহত্তম সমাজে এই বাউল সংগীত একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। প্রসঙ্গত বলা দরকার বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বের গানে বিশেষত রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতি সুরকারদের রচনায়, সুরে বাউল সংগীতের সুরের স্পর্শ খুঁজে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণকথাকে নিয়ে যেমন বৈষ্ণব ভক্ত কীর্তন সৃষ্টি করেছেন কালী, উমা মেনকার কথায় তেমনি শাক্ত কবিরা গানের সুরে ভগবৎ উপলব্ধির পথে যাত্রা করেছে। তবে রামপ্রসাদী গানে রাগ সংগীতের রূপবন্ধ খুঁজতে যাওয়া বৃথা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ বাংলার সর্বস্তরে তার ছাপ ফেলেছিল। নবজাগরণ অর্থাৎ তার পূর্ববর্তী চেতনার স্তরটি ছিল স্তিমিত বা সুপ্তিমগ্ন। একটু খেয়াল করলে দেখা

যাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বাংলা সংগীত ক্ষেত্রে শক্তিমান শিল্পীর সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। মোটামুটিভাবে বলা যায় ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর থেকেই খেয়াল বা ধ্রুপদ শ্রেণির সংগীত বিরল হয়ে পড়ছিল। পক্ষান্তরে টপ্পা পাঁচালি, কবিগান, তরজা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই জাতীয় গ্রাম্য লোকায়ত সংগীতের চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কীর্তনের গৌরব হ্রাস পাচ্ছিল এই সময়। খগেন্দ্র মিত্র এই প্রসঙ্গে বলেন,

> যতদুর জানা যায় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত কীর্তনের যথেষ্ট উন্নতি ছিল। ...সম্ভবত ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই কীর্তনের অবনতি ঘটিতে লাগিল। (কীর্তন: বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ)

ইংরেজ আগমনের মুহূর্তে এ দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে যে বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল তার ফলে অভিজাত স্তরের সংস্কৃতি চর্চাও প্রায় স্তব্ধ হয়েছিল। এই অবসরে প্রাধান্য পেয়েছিল কবিগান, তরজা, পাঁচালি বা টপ্পার মতো গ্রাম্য লোকায়ত সংগীতের ধারা।

মধ্যযুগে বাংলা সংগীত ধারায় যেমন যুক্ত হয়েছিল খেয়াল। ঠিক তেমনই ঊনবিংশ শতকে বাংলা সংগীতকে পুষ্ট করেছিল টপ্পা। টপ্পার জন্মস্থান পাঞ্জাব। গোলাম নবী তাঁর স্ত্রী শোরীর নামে ভণিতা রচনা করতেন বলে এই টপ্পার নাম হয়েছিল শোরী মিঞার টপ্পা। টপ্পার দুটি তুক - অস্থায়ী ও অন্তরা। খেয়ালের সব রাগই টপ্পায় ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র রাগিণীর দিক থেকে তফাৎ। প্রাচীন রাগিণীর মধ্যে শুধুমাত্র ভৈরবী, খাম্বাজ, চৈতাগৌরী, কালেংড়া, দেশ ও সিন্ধু - এই কয়টিতে টপ্পা গাওয়া হয়। বাংলাদেশে টপ্পার স্রষ্টা রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮২৮)। নিধুবাবু নামেই তিনি পরিচিত। বিখ্যাত গায়ক রসুল বক্স বলেছিলেন

> ভাষার দিকে নজর না দিলে নিধুবাবুর টপ্পা আর শোরী মিঞার টপ্পার
> কোনও পার্থক্য নাই

সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা থাকলেও অশ্লীলতার দায়ে তাকে অভিযুক্ত হতে হয়েছিল। ১৮৭৪ সালে প্রকাশিত 'গীতহার' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক গঙ্গাধর শর্মা এ প্রসঙ্গে বলেন,

> রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতি অনেকানেক সঙ্গীত রচয়িতারা নানাবিধ অশ্লীল সঙ্গীতের
> পরিচালনা করিয়া দেশের এই মহানিষ্ট সাধন করিয়া গিয়াছেন।

এই অশ্লীলতার দায়ে সেদিন অভিযুক্ত হয়েছিলেন দাশরথি রায়, কিংবা শ্রীধরের মতো সংগীত শিল্পীরাও। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে কীর্তন গান স্বমহিমায় উজ্জ্বল ছিল সেই কীর্তনের প্রভাব থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন। আবার লোকরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে কবি তরজাগানের রূপবন্ধ বা পদ্ধতির কোনরূপ অনুকরণের চেষ্টাও তাঁদের ছিল না।

এর ঠিক পরই বাংলা সংগীত জগতে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। এই যোগাযোগটি বোধহয় তাৎপর্যহীন নয়। কারণ অষ্টাদশ শতকের গানে যে নিম্নগামীতার চিহ্ন ছিল নিধুবাবু, দাশু রায় বা শ্রীধর কথকের সংগীত সাধনায়, তা থেকে একটা উত্তরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের হাতে সেই প্রচেষ্টা একটি বলয়িত রূপ নেয়। ভারতীয় অর্কেষ্টার একটা নতুন রূপের আত্মপ্রকাশ ঘটল। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার অর্কেষ্ট্রার একটা

ধারা ভারতবর্ষে বরাবরই ছিল। শার্ঙ্গদেব পর্যন্ত শাস্ত্রকারেরা শিল্পী সংখ্যা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার বৃন্দের উল্লেখ করে স্পষ্টত ইঙ্গিত করেছেন যে তুর্কি আক্রমণের পূর্ববর্তী কালে ভারতবর্ষে অর্কেস্ট্রার প্রচলন ছিল। সেই যুগে গীত-বাদ্য-নৃত্য সহযোগে সংগীত পরিবেশনের রীতির সঙ্গে সংগতি আছে 'গীতগোবিন্দ' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' এর আঙ্গিক পরিকল্পনার। এরপর মুসলিম আমলের দরবারি গানের আসরে এই জাতীয় সংগীতের কদর কমে যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের সংস্কৃতি চেতনায় আমরা দুটি ভাবপ্রবণতার সহাবস্থান সর্বত্র লক্ষ্য করি। এক, পাশ্চাত্য রীতিনীতি আদর্শের প্রতি আগ্রহ এবং এদেশের সৃষ্টিসমূহে তাকে আত্মস্থ করবার আকাঙ্ক্ষা। দ্বিতীয়ত প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবার প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের সংগীত সাধনায় অর্কেস্ট্রা গঠনের আগ্রহ এবং গীতিনাট্য রচনার প্রবণতার মধ্যেও যেন সেই প্রাচীন যুগের সংগীত ভাবনারই এক সচেতন অথবা অবচেতন অনুসরণ দেখতে পাই। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের হাত ঘুরে বাংলা সংগীত জগতে 'ইউরোপীয়' সংগীত ঘরানাও এসে পৌঁছুল। ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রথায় স্বরলিপি লিখনের প্রচেষ্টায় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মনোনিবেশ করলেন।

এইভাবে ধ্রুপদী, পাশ্চাত্য ও দেশজ ধারার ত্রিবেণী সঙ্গমে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের স্থাপত্য শৈলীর সহজ বিকাশ, মনমোহন বসুর গীতাভিনয়ের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনার পরিপূর্ণতা, নিধু গুপ্ত ও দাশু রায়ের টপ্পা পাঁচালির মার্জিত রসরূপ এবং নাট্য সংগীতের মর্মস্পর্শীতা রবীন্দ্রনাথের ভেতর দিয়ে বিচিত্র বর্ণে অনুরঞ্জিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র দেশে।

বাংলাদেশের সংগীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যা প্রাচীন তাকে বাঙালি অনুকরণ করেনি, পরিত্যাগও করেনি তবে অনুসরণ করেছেন। বাঙালির রসচেতনায় বারে বারেই তা আত্মস্থ হয়ে নতুনরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এটাই বাঙালির ধর্ম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়তে পারে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> আজ হোক কাল হোক বাংলা গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপন রাস্তাতেই করবে, আর কারো বাঁধা রাস্তায় করবে না। (শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সংগীতের স্থান)

তাই বাল্মীকির রামায়ণ কৃত্তিবাসের হাতে নতুন রূপ পায়। বাঙালির সংগীত সাধনাও তেমনি রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ, নৃত্যে উদয়শঙ্কর, বাদ্যে সুরেন্দ্রনাথ-তিমিরবরণ-এর মাধ্যমে পরিণাম সন্ধানী হয়ে পড়ে।

গ্রন্থঋণ

১. রাগ ও রূপ : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ
২. কীর্তন , বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : খগেন্দ্র মিত্র
৩. ভক্তি রত্নাকর : নরহরি কবিরাজ
৪. মুঘল যুগের সঙ্গীত চিন্তা : রাজ্যেশ্বর মিত্র